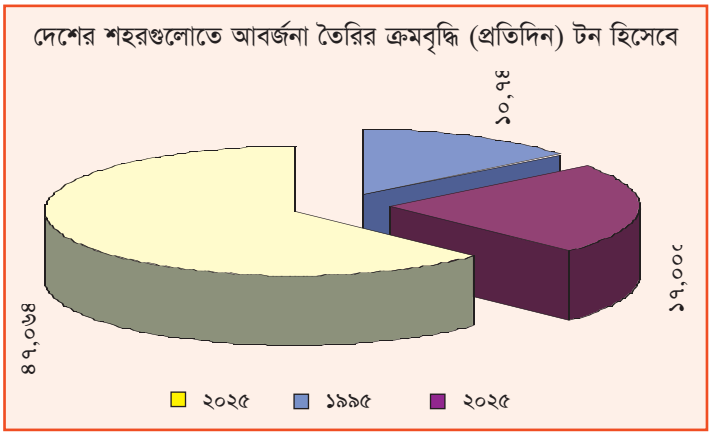

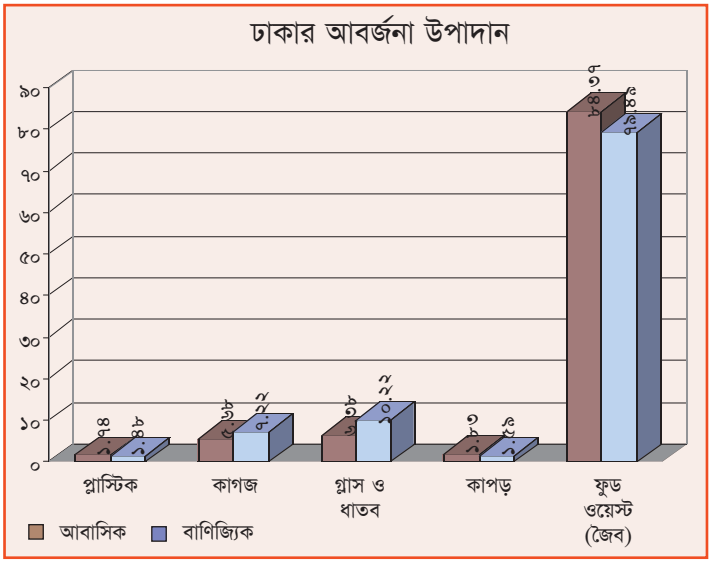

আবর্জনা থেকে সার

বছরে লাভ ১০২ কোটি

- আপনিও বিনিয়োগ করতে পারেন
- ৫ লাখ বিনিয়োগে বার্ষিক লাভ ৪ লাখ

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

প্রতিদিন ঢাকায় সাড়ে ৪ হাজার টন আবর্জনা তৈরি হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে বর্তমানে প্রতিদিন ১৭ হাজার টন আবর্জনা তৈরি হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ আবর্জনা অপসারণ এ দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

খোদ রাজধানী ঢাকার উৎপাদিত আবর্জনার মাত্র ৪২ ভাগ সিটি কর্পোরেশন অপসারণ করতে পারছে। বাদবাকি আবর্জনার ১৫ ভাগ (অজৈব আবর্জনা) টোকাই এবং দরিদ্র নারীরা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। অবশিষ্ট ৪৩ ভাগ আবর্জনা অপসারিত হচ্ছে না। এই আবর্জনা রাজপথ, ফুটপাত, গলিপথ, নর্দমাসহ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিদিন। এগুলো পচে উৎকট দুর্গন্ধ তৈরি হয়। কিছুদিন পর এই পচা আবর্জনা শুকিয়ে ধুলা হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য

সংস্থার এক জরিপে দেখা যায়, এই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা থেকে চর্মরোগ, প্লেগ, আমাশয়, ফুসফুসজনিত রোগসহ কমপক্ষে ৪০ প্রকার রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

এই আবর্জনা বাংলাদেশের শহরগুলোর বিশেষ করে ঢাকার নাগরিক জীবন বিষিয়ে তুলেছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রতিবছর ময়লা অপসারণের জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ করছে। তারপরও ডিসিসি মাত্র ৪২ ভাগ আবর্জনা অস্বাস্থ্যকরভাবে অপসারণ করতে পারছে। একটি হিসাবে দেখা যায়, প্রতি টন ময়লা অপসারণ করতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন খরচ করছে ২ হাজার ৪৫ টাকা। তার অর্থ ৫ টনের এক ট্রাক ময়লা অপসারণ করতে খরচ হচ্ছে ১০ হাজার টাকারও বেশি!

অন্যদিকে ডিসিসির ময়লা সংগ্রহ, পরিবহন এবং ডাম্পিং কোনোভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত এবং আধুনিক নয়। ময়লার ডাস্টবিনগুলো মোটেই পরিকল্পিতভাবে বসানো হয়নি। ডাস্টবিনের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ময়লা উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। খোলা ট্রাকে পরিবহনের কারণে রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে ময়লা। সবশেষে এই ময়লা ডাম্পিং এলাকায় যেভাবে ডাম্প করা হচ্ছে তা সত্যিই ভয়াবহ। এই ময়লা থেকে অনবরত নির্গত হচ্ছে তরল লিচেট, যা মাটি চুইয়ে নিচের দিকে নামছে। এই বিষাক্ত পদার্থ কোনোভাবে যদি একবার মাটির তলায় পানির সঙ্গে মিশে যায় তবে ঐ পানি ১ হাজার বছরেও ব্যবহার করা যাবে না।

সবদিক থেকেই আবর্জনা আমাদের জন্য

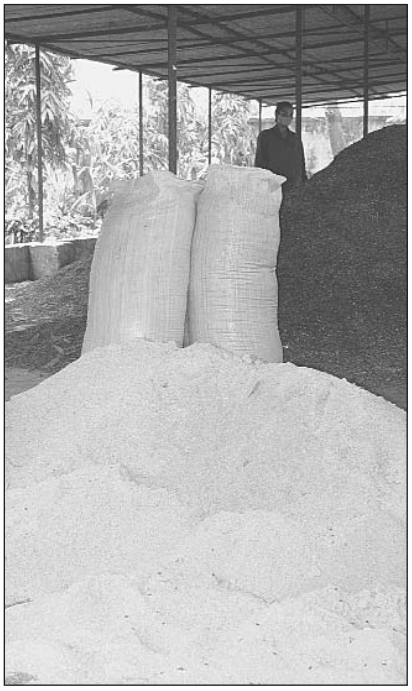

৫ লাখ টাকায় ৩ টনের কম্পোস্ট প্লান্ট

৫ লাখ ২৩ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে আপনি ৩ টন ক্যাপাসিটির একটি প্লান্ট করতে পারেন। ২৩ মাসের মধ্যে আপনার সব বিনিয়োগ উঠে আসবে।

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকায়)
১. কম্পোস্টিং সেড নির্মাণ	২ লাখ ৬৮ হাজার
২. সটিং সেড নির্মাণ	৪৫ হাজার ২০০
৩. অফিস ও ফ্যাক্টরির অবকাঠামো	৫০ হাজার
৪. চারটি রিকশাভ্যান ক্রয়	৬০ হাজার
৫. পানি ও বিদ্যুৎ কানেকশন	৫০ হাজার
৬. কম্পোস্টিং যন্ত্রপাতি ও কর্মীদের ড্রেস	৫০ হাজার
মোট ফিক্সট ব্যয়	৫ লাখ ২ হাজার ২০০

৩ টনের প্লান্টে ১ বছরের পরিচালন ব্যয়

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (টাকায়)
১. মাসিক বেতন ৬ জন কর্মীর	৭২ হাজার (জন প্রতি মাসে ১০০০)
২. মাসিক বেতন ৪ জন ভ্যান ড্রাইভার	৭২ হাজার (জন প্রতি মাসে ১৫০০)
৩. প্রকল্প ম্যানেজারের বেতন	৬০ হাজার (মাসিক ৫ হাজার)
৪. মাসিক বেতন ৪ জন আবর্জনা সংগ্রহকারীর	৫৭ হাজার (জন প্রতি মাসে ৮০০)
৫. বিদ্যুৎ এবং পানির বিল	৫ হাজার
৬. কম্পোস্টের মেটিরিয়াল	১২ হাজার
মোট বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়	২ লাখ ৭৮ হাজার ৬০০

৩ টনের প্লান্টে বাৎসরিক আয়

আয়ের খাত	আয় (টাকায়)
জৈব সার বিক্রি (২,৪৩০ টন)	৬ লাখ ৭৫ হাজার
বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা কালেকশন ফি বাড়ি প্রতি ২০ টাকা	২০ হাজার
বাৎসরিক আয়	৬ লাখ ৯৫ হাজার
বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়	২ লাখ ৭৮ হাজার ৬০০
দ্বিতীয় বছর থেকে মোট বাৎসরিক লাভ	**৪ লাখ ১৬ হাজার ৪০০**
বি: দ্র: জমির ভাড়া এই হিসাবে ধরা হয়নি	

এক মারাত্মক অভিশাপ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নানা রকম উপায়ের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

পৃথিবীর সব দেশেই আবর্জনাকে এক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা হিসেবে দেখা হতো। আমেরিকা এবং জাপানের মতো দেশগুলোর প্রতিজন নাগরিক প্রতিদিন একজন বাংলাদেশীর চেয়ে ৪ থেকে ৬ গুণ বেশি আবর্জনা তৈরি করছে। কিন্তু জনসংখ্যার ঘনত্ব কম এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে তারা তা ভালোভাবে সামলে নিতে পারছে।

তবে বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল সবগুলো দেশই আবর্জনা রিসাইক্লিং করে পুনঃব্যবহারে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। জাপান, আমেরিকা এবং জার্মানির মতো দেশগুলো আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভারতসহ কয়েকটি দেশে আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস এবং জৈব সার তৈরি হচ্ছে। কোনো কোনো দেশ আবর্জনা থেকে ফুয়েল তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে।

'৯০-এর দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশে এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ অথবা ফুয়েল তৈরির বিষয়টি এখনো পরীক্ষাসাপেক্ষ, কিন্তু আবর্জনা থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার তৈরির বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা ওয়েস্ট কনসার্ন '৯৭ সাল থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে তা থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন করছে।

ওয়েস্ট কনসার্ন প্রথমে মিরপুরে ৩ টন ক্যাপাসিটির একটি প্লান্ট থেকে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বেইলি রোড, গ্রিন রোড, ধলপুর এবং কল্যাণপুরসহ ৫টি প্লান্ট তৈরি হয়েছে।

তাদের অনুসরণ করে সিলেট এবং খুলনায় অপর ২টি এনজিও আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরির প্লান্ট তৈরি করেছে। ইউএনডিপি একই প্রযুক্তিতে দেশের ১৪টি জেলা শহরে প্লান্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। অপর একটি বেসরকারি সংস্থা দেশবাংলা কল্যাণ পরিষদ গোড়ানে একটি প্লান্ট স্থাপন করেছে। ওয়েস্ট কনসার্ন ব্যতীত অন্য প্লান্টগুলো এখনো বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়নি। ওয়েস্ট কনসার্নের চালু ৩টি প্লান্ট থেকে এখন বছরে প্রায় ৫০০ টন জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে। যা আলফা এগ্রো নামের একটি মার্কেটিং কোম্পানি বাজারজাত করছে। ওয়েস্ট কনসার্ন আবর্জনা থেকে উৎপাদিত প্রতি কেজি জৈব সার ২ টাকা ৫০ পয়সা (টন ২৫০০ টাকা) দরে সরবরাহ করছে।

আলফা এগ্রো প্যাকেজিং কোম্পানি ম্যাপ এগ্রোর সহায়তায় ওয়েস্ট কনসার্নের সরবরাহকৃত জৈব সার মেশিনের সাহায্যে আরো কিছুটা গুঁড়ো করে প্যাকেজ করে প্রতি কেজি ৬/৭ টাকা দরে বাজারজাত করছে। মান

৫ টনের এক ট্রাক ময়লা অপসারণ করতে ডিসিসি খরচ করছে ১০ হাজার টাকারও বেশি! সূত্র: ওয়েস্ট কনসার্ন

ঢাকার আবর্জনা কম্পোস্টের জমি

ঢাকায় প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার টন ময়লা উৎপাদিত হয়। এর ৮০ ভাগের বেশি জৈব আবর্জনা। ঢাকার সব আবর্জনা কম্পোস্ট করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের ১০টি জোনে কম্পোস্ট প্লান্ট বসানো যেতে পারে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে কম্পোস্ট প্লান্টের জন্য জোনভিত্তিক যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন-

ডিসিসি জোন	বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা	প্লান্টের জন্য জমি প্রয়োজন (একর)	যে পরিমাণ সরকারি জমি খালিআছে (একর)
১.	১ লাখ ২৫ হাজার	৪.০২	১৪.২৯
২.	১ লাখ ২৫ হাজার	৪.০২	০.৩৩
৩.	৬৫ হাজার	২.০৮	
৪.	১ লাখ ৮ হাজার	৩.৪৭	১৫.০৫
৫.	১ লাখ ২৬ হাজার	৪.১৪	১.৩৭
৬.	৬৯ হাজার ৩০০	২.২৩	৩.৫
৭.	১ লাখ ২৬ হাজার	৪.০৩	২.০৬
৮.	১ লাখ ৩৭ হাজার	৪.৩৮	০.৫১
৯.	৭৯ হাজার	২.৫৪	৩.৭
১০.	২৫ হাজার	০.৭৯	

'ডিসিসি ময়লা অপসারণের জন্য প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকা খরচ করছে, কিন্তু তারা যদি আবর্জনাগুলোকে জৈব সারে পরিণত করতে পারে তবে ৩০ কোটি টাকা খরচ তো হবেই না বরং প্রতি বছর ৩৬ কোটি টাকা বেশি আয় করতে পারবে'

এএইচ মাকসুদ সিন্‌হা
নির্বাহী পরিচালক, ওয়েস্ট কনসার্ন

উন্নয়নের জন্য সামান্য পরিমাণে নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম এবং সালফার মিশ্রিত করে প্রতি কেজি ১২/১৩ টাকা করে বিক্রি করছে। ম্যাপ এ্যাগ্রোর কনসালটেন্ট ড. জয়নাল আবেদিন ২০০০কে বলেছেন, 'ওয়েস্ট কনসার্নের উৎপাদিত জৈব সারের মান খুবই উন্নত, তাই এখন আর নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম ইত্যাদি মেশানোর প্রয়োজন হচ্ছে না।'

ম্যাপ এ্যাগ্রোর কর্মকর্তা ওবায়েদুর রহমান ২০০০কে বলেছেন, 'জৈব সার ব্যবহার করে চাষীরা বেশ ভালো ফল পাচ্ছেন। যার কারণে এই সারের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ১৫ হাজার টন জৈব সারের চাহিদা বাজারে তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমরা মাত্র ৫শ' টন দিতে পারছি।'

ওয়েস্ট কনসার্নের নির্বাহী পরিচালক এএইচ মাকসুদ সিন্‌হা ২০০০কে জানান, 'সারা দেশে প্রতিবছর ৩৫ লক্ষ টন কেমিক্যাল সার ব্যবহার হচ্ছে, সারাদেশের সবগুলো শহরের আবর্জনা দিয়ে জৈব সার তৈরি করা হলে ১৮ থেকে ২০ হাজার টন কম্পোজ সার পাওয়া যাবে। যা দিয়ে দেশের মোট সারের চাহিদার মাত্র ২৭ ভাগ পূরণ করা সম্ভব। তাই সব সময় এই জৈব সারের চাহিদা থাকবে। কেউ যদি এ খাতে বিনিয়োগ করে তার জন্য বাজার তৈরি আছে'।

জৈব সার প্লান্ট কিভাবে করবেন

দৈনিক ৩ টন ক্যাপাসিটির একটি প্লান্ট তৈরি করতে বিনিয়োগ করতে হবে ৫ থেকে সাড়ে ৫ লাখ টাকা (বিস্তারিত বক্সে দেখুন)। ৩ টনের প্লান্ট থেকে আপনি প্রতিদিন ৬৭৫ কেজি জৈব সার পাবেন। যা কোনো রকম প্রক্রিয়াজাত না করেই আপনি প্রতি কেজি আড়াই টাকা দরে দৈনিক ১৬৮৭ টাকায় বিক্রি করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে মাসে সার বিক্রি থেকে আপনার আয় হবে প্রায় ৫০ হাজার টাকা, বছরে প্রায় ৬ লাখ টাকা। ৫০/৬০ হাজার টাকা বাড়তি বিনিয়োগ করে একটি গ্র্যান্ডিং মেশিন কিনে সার আরো গুঁড়ো করে প্যাকেটজাত করে বিক্রি করলে আপনার আয় দেড়গুণের বেশি হতে পারে।

সার বিক্রির একটি বড় অংশই আপনার লাভ হতে পারে, যদি আপনি বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করেন। ওয়েস্ট কনসার্ন তাদের ৩ টনের প্লান্টের জন্য ১ হাজার বাড়ি থেকে রিকশা-ভ্যানের সাহায্যে আবর্জনা সংগ্রহ করে থাকে, আবর্জনা অপসারণের বিনিময়ে বাড়ি প্রতি মাসিক ২০ টাকা করে সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে। যা থেকে ভ্যানচালক এবং অন্যদের বেতনসহ প্লান্টের মাসিক খরচের ৩৫ ভাগ চলে আসে। হিসাব করে দেখা গেছে, স্থাপন এবং পরিচালন ব্যয় আপনার প্রথম ২৩ মাসের মধ্যে উঠে আসবে। তারপর প্রতি বছর পরিচালন ব্যয় হবে ২ লাখ ৭৯ হাজার টাকা, বিপরীতে আপনি পাবেন প্রায় ৬ লাখ টাকা। ৫ বছর পর প্লান্ট সংস্কার করার প্রয়োজন হতে পারে। সংস্কারের খরচ খুব বেশি নয়।

এরকম একটি প্লান্ট করার জন্য আপনার কমপক্ষে ৪ কাঠার একটি খালি জায়গায় প্রয়োজন হবে। ঢাকায় জমির দাম অত্যধিক হওয়ায় ঢাকা সিটির মধ্যে জমি কিনে প্লান্ট বসিয়ে লাভ করা দুরূহ। তাই নিজস্ব জমি না থাকলে নগরের আশপাশে জমি লিজ নিতে পারেন। তাছাড়া এ ধরনের কাজকে সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আপনি যদি আপনার প্রকল্প বিশ্বাসযোগ্য করে পিডব্লিউডি, সিটি কর্পোরেশন অথবা সরকারের অন্যান্য সংস্থার কাছে উপস্থাপন করতে পারেন তবে আপনি ফ্রি জমি পেয়ে যেতে পারেন।

প্লান্ট স্থাপনের জন্য ওয়েস্ট কনসার্নকে পিডব্লিউডি ৭টি, ডিসিসি ও ঢাকা লায়ন্স ক্লাব ১টি করে জায়গা দিয়েছে। আপনি চেষ্টা করলে ইউএনডিপি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা পেয়ে যেতে পারেন।

ওয়েস্ট কনসার্নের নির্বাহী পরিচালক মাকসুদ সিন্‌হা ২০০০কে বলেন, 'কেউ এ

ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা

আবর্জনা থেকে সার তৈরির জন্য কমিউনিটি ইউনিটের স্থানীয় নেতা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও সার তৈরির ইউনিটের সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিক সভার পর প্রাইমারি কালেকশন স্কিম চূড়ান্ত করা হয়েছিল। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সবার সঙ্গে আলোচনা করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হয়। সার তৈরির জন্য স্থান খুঁজে বের করা ঘন জনসংখ্যাপূর্ণ এলাকায় এতো সহজ ছিল না। পরবর্তীতে অনেক আলাপ-আলোচনার পর নদীর ধারে আবর্জনা রাখার স্থানের নিকটবর্তী একটি আদর্শ স্থান খুঁজে বের করা হয় কম্পোস্ট প্লান্টের জন্য।

প্লান্টের জন্য আবর্জনা মূলত ৬০% পরিবারবর্গ থেকে সরবরাহ করা হয় এবং বাকি ৪০% বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স থেকে সরবরাহ করা হয়। পরিবারের আবর্জনা দুই চাকাবিশিষ্ট হাতল গাড়ি দ্বারা প্রতিদিন একবার সংগ্রহ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্সের আবর্জনা সপ্তাহে দুইবার ছোট ট্রাকের সাহায্যে সংগৃহীত হয়। মিনোমারটানি মিশ্রসার তৈরির ইউনিটে প্রতিদিন গড়ে ১২.৪ টন কাঁচা আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ হয়। কাঁচা আবর্জনা প্রথমে মেনুয়ালি জৈব ও অজৈব স্তূপে বাছাই করা হয়। অজৈব বস্তুকে পাবলিক কিলিনজিং ডিপার্টমেন্টের দ্বারা মিউনিসিপ্যালের জমিতে পরিবহনের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। জৈব বস্তু পরবর্তীতে বাঁশের ত্রিভুজ আকৃতির টানেলের চারপাশে স্তূপীকৃত করা হয়।

এই মিশ্র সার তৈরির কৌশল ১৯৮৯ সালে জার্কাতার পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১৯৯২ সালে সেন্টার ফর পলিসি অ্যান্ড ইমপিলিসেনটেশন স্টাডিজ যৌথভাবে হার্ভার্ড ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে মিশ্র সার তৈরির কৌশল পরীক্ষা করেছিল। স্টাডিজের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মিনোমারটানির মিশ্র সার তৈরি ইউনিট একই মিশ্র সার তৈরির পদ্ধতি শুরু করেছিল যা পরবর্তী সময়ে প্রকল্পে উন্নত করা হয়। দু'দিনের জৈব আবর্জনা দিয়ে একটি স্তূপ এবং সপ্তাহে তিনটি স্তূপ করা হতো। প্রথম চার সপ্তাহে দৈনিক ভিত্তিতে স্তূপের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রক্রিয়ার সময় সাধারণ মেনুয়াল পদ্ধতিতে আর্দ্রতা নির্ণয় করা হয় এবং স্তূপে পানির প্রয়োজন হলে পানির ক্যান দিয়ে পানি দেয়া হয়। প্রক্রিয়ার সময় অপচনশীল বস্তুকে সারিতে ফেলা হয় । চতুর্থ সপ্তাহের পর মিশ্র সার পরিপক্ব করতে অতিরিক্ত এক মাস সময় দিতে হয়। পরবর্তীতে তা পর্দা দ্বারা ঢাকতে হয় এবং বিক্রির জন্য মোড়কীকরণ করা হয়। পর্দা দ্বারা আবৃত জৈবের অবশিষ্টাংশ সতেজ মিশ্র সারের স্তূপে ফেরত পাঠাতে হয়। উল্লেখ্য, ওয়েস্ট কনসার্ন জৈব সার তৈরির প্রযুক্তির ধারণা পেয়েছে ইন্দোনেশিয়া থেকে।

সালাউদ্দিন সর্দার

কলকাতার ব্যবস্থাপনা

কয়েক বছর আগে কলকাতা একটি নোংরা নগরী ছিল। কিন্তু আজ কলকাতাকে একটি পরিচ্ছন্ন নগর হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সমগ্র সিএমসিকে (কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) ১৪১ ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে আবর্জনা ব্যবস্থাপনার জন্য সংরক্ষণ ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুরো কলকাতা সিটিকে আবার ১৫টি শহরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি শহরের প্রধান একজন জেলা সংরক্ষণ অফিসার। তাকে সহায়তা করেন সংরক্ষণ সুপারভাইজাররা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শহর/ওয়ার্ডের জনসংখ্যার ওপর ভিত্তিতে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োজিত আছে। সিএমসি'র সংরক্ষণ ও মোটর গাড়ি বিভাগের প্রধান চিফ মিউনিসিপ্যাল প্রকৌশলী। আবর্জনা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন গ্রেডের ১৫০০০ কর্মচারী আছে যার মধ্যে ১৩০০০ পরিচ্ছন্ন সেবায় নিয়োজিত।

গড়ে প্রতিদিন ২৫০০ মেট্রিক টন আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। স্কিল্ড স্টাফরা ভোর পাঁচটায় তাদের কাজ শুরু করে অবিরত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে। এর মধ্যে আধা ঘন্টা বিরতি। সংরক্ষণ কর্মচারীরা প্রথমে আবর্জনা বহন করে এবং রাস্তা ও ফুটপাত পরিষ্কার করে পরবর্তীতে সংগৃহীত ময়লা কন্টেইনারে জমা করে। এই কাজ সকাল সাড়ে সাতটায় শেষ হয়।

সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সংরক্ষণ কর্মচারীরা বাঁশি বাজিয়ে আবাসিক এলাকা থেকে আবর্জনা নিয়ে আসে। যা সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত চলতে থাকে। সংগৃহীত আবর্জনা নিটকবর্তী কন্টেইনারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে আবর্জনা গাড়িতে করে কম্পোস্টের জন্য নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সব ওয়ার্ডে এই প্রক্রিয়ায় বাড়ি থেকে বাড়ির আবর্জনা সংগ্রহ করতে দেখা যায়।

আবর্জনা পরিবহন করার জন্য পাঁচটি প্রধান ও তিনটি সাবগেরেজ পরিচালনা করা হয়।

প্রতিদিনের আবর্জনার ৪৫% ব্যক্তিগত বাহনে পরিবহন করা হয়। অবশিষ্ট ৫৫% মেনুয়ালি লোডেড বিহিকল, পে লোডার বিহিকল ও কন্টেইনারিজ বিহিকলে পরিবহন করা হয়।

আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য সিএমসি ইস্টার্ন অর্গানিক ফার্টিলাইজার (প্রাঃ) লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেছে। কর্পোরেশন কোম্পানিটিকে নামমাত্র ভাড়ায় জমি দিয়েছে। যখন কোম্পানি পুরোদমে কাজ করবে তখন প্রতিদিন ৭০০ টন আবর্জনা গ্রহণ করবে এবং সার উৎপাদন করবে। ক্ষুদ্র উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই উৎপাদন শুরু হবে।

খাতে বিনিয়োগ করতে চাইলে আমরা পরামর্শসহ সম্ভব সব ধরনের সহায়তা করবো।'

৩ টন ক্ষমতার একটি প্লান্টের জন্য আপনার ৬ জন কর্মী, ৪ জন ভ্যান ড্রাইভার, ৬ জন আবর্জনা সংগ্রহকারী এবং ১ জন প্লান্ট ম্যানেজার প্রয়োজন হবে।

৩ টনের ছোট আকারের একটি প্ল্যান্ট উপরোক্ত পদ্ধতিতে শুরু করতে পারেন। বড় আকারের প্লান্ট করতে চাইলে আনুপাতিক হারে বিনিয়োগ এবং আয় বাড়বে।

২০০ থেকে ৩০০ টন বা তার বেশি ধারণ ক্ষমতার প্লান্ট সেমি মেকানিক পদ্ধতিতে করতে চাইলে উৎপাদন এবং লাভ দুটোই বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, উপরে উল্লিখিত ৩ টনের প্লান্টের সব কাজই হয় মেনুয়ালি, এতে কোনো যন্ত্রের ব্যবহার নেই। সব কাজই মেনুয়ালি এবং দেশী প্রযুক্তিতে।

যেভাবে সার তৈরি হয়

জৈব সার তৈরি হয় আবর্জনার শুধু জৈব অংশ থেকে। ঢাকায় আবর্জনার ৮০ থেকে ৮৪ ভাগ জৈব পদার্থ, বাকিটা অজৈব। সার তৈরির জন্য আবর্জনা সংগ্রহের পর প্রথমেই অজৈব অংশ (পলিথিন, প্লাস্টিক, রাবার এবং ধাতব পদার্থ) আলাদা করতে হবে। ওয়েস্ট কনসার্ন এ কাজটি মেনুয়ালি করে। তবে জাপান এবং আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলোতে এ কাজ অটোমেটিক মেশিনে করা হয় যা খুব ব্যয়বহুল। সেসব দেশে শ্রমিক মূল্য বেশি হওয়ায় মেশিন ব্যবহার তাদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের এখানে শ্রমিক সস্তা হওয়ায় এ কাজটি মেনুয়ালি করাই শ্রেয়।

জৈব এবং অজৈব আবর্জনা পৃথক করার পর জৈব আবর্জনার সঙ্গে ৫ ভাগ কাঠের গুঁড়ো এবং ৪ ভাগ গোবর (যদি প্রয়োজন হয়) মেশানো হয় কার্বন নাইট্রোজেন ব্যালান্স করার জন্য। এরপর বাঁশের তৈরি এয়ারেটর (বাঁশের ত্রিভুজ আকৃতির টানেল) বা ইট-সিমেন্টের তৈরি বাক্সের মধ্যে ৪০ দিন স্তূপ করে রাখা হয়। এই ৪০ দিনের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একবার তাপমাত্রা এবং জলীয়বাষ্প পরীক্ষা করতে হবে। তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রির বেশি হলে নাড়িয়ে দিতে হবে। জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমে গেলে পরিমাণমতো পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। ৪০ দিন পর এয়ারেটর থেকে নামিয়ে ম্যাচিউরড হওয়ার জন্য ২ সপ্তাহ ফেলে রাখা হয়। এরপর চালুনিতে ফেলে চালা হয়। চালা শেষে গ্র্যাডিং মেশিনে ফেলে গুঁড়ো করে প্যাকেট ভরে বাজারজাত করা হয়।

বড় আকারের প্লান্টের জন্য বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের পাশাপাশি নগরীর সবজি মার্কেটগুলো থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এছাড়া ডাম্পিং এরিয়ার কাছাকাছি প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা ২০০০কে বলেছেন, 'জৈব সার প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহীদের সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সম্ভবপর সবরকম সহায়তা দেয়া হবে।'

এদিকে ডিসিসির প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার সৈয়দ ফারুকী ২০০০কে বলেছেন, 'যারা কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন করার জন্য যদি কেউ সিটি কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করে তবে ট্রাকের মাধ্যমে আবর্জনা তার প্লান্টে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।'

ঢাকার বাইরে অন্য শহরগুলোতে এরকম

প্লান্ট স্থাপন করা আরো লাভজনক। কারণ সেখানে খোলা জায়গা পাওয়া সহজ।

পারিবারিক পর্যায়ে কম্পোস্ট ব্যারেল

শুধু প্লান্ট নয়, ২ ফুট জায়গায় একটি কম্পোস্ট ব্যারেল স্থাপন করে প্রতিটি বাড়িতে তৈরি হতে পারে জৈব সার। সাধারণত ৪৫ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন খালি তেলের ড্রাম/ব্যারেলের গায়ে এবং নিচের অংশে আধা ইঞ্চি ব্যাসের অনেকগুলো ছিদ্র করা হয়, যাতে করে ব্যারেলের ভেতরে বাতাসের অক্সিজেনের সহায়তায় ব্যাকটেরিয়া কম্পোস্ট তৈরি করতে পারে। ব্যারেলের মাথায় ব্যারেলের চেয়ে বড় একটি ঢাকনা দিয়ে দেয়া হয় যাতে বৃষ্টির পানি ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ব্যারেলের নিচের অংশে ১ বর্গফুট পরিমাণ একটি কপাট তৈরি করে আটকে রাখতে হয়। যাতে পরবর্তীতে সেটি খুলে সার বের করা যায়। ব্যারেলটি ইট, বালু, সিমেন্টের তৈরি একটি রিংয়ের ওপর স্থাপন করতে হয়। এই ব্যারেল শহরের বাসা-বাড়ি কিংবা যে কোনো খোলা জায়গায়, উদ্যানের পাশে, বাড়ির এক পাশে, ছাদে স্থাপন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে এটি সহজেই স্থানান্তর করা যায়।

পারিবারিক পর্যায়ে জৈব সার তৈরির কম্পোস্ট ব্যারেল

এরপর গৃহস্থালি আবর্জনার জৈব অংশ ব্যারেলের মধ্যে ফেলতে হবে। ৩/৪টি পরিবার মিলে একটি ব্যারেল ব্যবহার করলে ৪ বছরেও ব্যারেলটি পূর্ণ হবে না। কারণ প্রতিদিনই আবর্জনা পঁচে পরিমাণ কমতে থাকবে। প্রথমবার আবর্জনা ফেলার ৩ মাস পর তা সারে পরিণত হতে থাকবে। তারপর নিচের কপাট খুলে সার বের করে গাছপালা, সবজি, ফুলের বাগানে ব্যবহার করতে পারেন, এমনকি আপনি বিক্রিও করতে করতে পারেন। ব্যারেলের ভেতরে গৃহস্থালি আবর্জনার পাশাপাশি বাগানের আবর্জনাও ফেলতে পারেন। স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা বাগানের যে কোনো জায়গায় একটি ব্যারেল বসিয়ে নিলে কোনো সংস্থার ওপর নির্ভর না করে যে কোনো সময়ে হাতের নাগালের মধ্যে আপনার গৃহস্থালি আবর্জনা ফেলতে পারেন। প্রাণীর নাড়িভুঁড়ি না ফেললে ব্যারেলের ভেতরে তেমন গন্ধ হয় না। এতে আপনার চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকবে। তার ওপর আপনি পাবেন উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার। আপনার গাছপালা, বাগান ও টবের জন্য আপনার আর রাসায়নিক সার কিনতে হবে না।

উন্নত দেশগুলোতে এবং আমাদের দেশের বিদেশী দূতাবাসগুলোতে এই পদ্ধতিতে বাগানে ব্যবহারের জন্য সার তৈরি করা হচ্ছে। প্লাস্টিক অথবা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি তেলের খালি ব্যারেল কিনে আপনি কম্পোস্ট ব্যারেল তৈরি করে নিতে পারেন অথবা ওয়েস্ট কনসার্নের কাছ থেকে তৈরি ব্যারেল কিনতে পারেন। রিংসহ তৈরি ব্যারেলের দাম পরবে ২ হাজার টাকার মতো। প্লাস্টিকের তৈরি ব্যারেলে ১০/১২ বছর চলবে।

দেশের শহরগুলোতে প্রতিদিন ১৭ হাজার টন এবং বছরে ৬১ লক্ষ ২০ হাজার টন আবর্জনা তৈরি হচ্ছে। এই আবর্জনার জৈব অংশ (৮০ ভাগ) দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা হলে বছরে পাওয়া যাবে ১২ লাখ ২৪ হাজার টন উৎকৃষ্টমানের জৈব সার, যার বিক্রয় মূল্য ৩০৬ কোটি টাকা। দুই তৃতীয়াংশ খরচ বাদ দিলে নীট লাভ ১০২ কোটি টাকা।

জৈব সার কেন ব্যবহার করবেন

দেশের সবগুলো শহরে যদি ব্যাপকভাবে জৈব সার উৎপাদন শুরু হয়, সেটা বাণিজ্যিক প্লান্টে হতে পারে অথবা বাড়ি বাড়ি ব্যারেল পদ্ধতিতে হতে পারে। তাতে আবর্জনা আর যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে না। আবর্জনাকে সম্পদ মনে করে তা কম্পোস্টের জন্য তুলে নেয়া হবে। চারদিকের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকবে, তখন আর রাস্তার ধারে অস্বাস্থ্যকর ডাস্টবিন থাকার দরকার হবে না। বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা সংগৃহীত হয়ে সরাসরি প্লান্টে চলে যাবে। এই সার তৈরিতে ঢাকার আবর্জনার জন্য ১৬ হাজার এবং সারা দেশের শহরগুলোর জন্য ৯০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

তাছাড়া জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারই উত্তম। এতে মাটির গুণাগুণ ঠিক থাকে। একই জমিতে পর পর ৩ বছর রাসায়কি সার ব্যবহার করলে মাটির ভেতরের জৈব জীবগুলো মারা যায়, মাটি শক্ত হয়ে যায়, অক্সিজেন কমে যায়। মাটি তখন আর পানি ধারণা করতে পারে না। এভাবে মাটির উর্বরাশক্তি কমে যায়। আদর্শ মাটিতে ৫ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকা জরুরি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, দেশে ৮৩ শতাংশ জমিতে জৈব অংশ দেড় শতাংশেরও কম। তাই আবর্জনা থেকে তৈরি জৈব সার মাটির হারানো উর্বরাশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে।

অন্যদিকে জমিতে যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তার ৫০ ভাগের বেশি মাটি গ্রহণ করতে পারে না। বাকি সার পানিতে মিশে গিয়ে চক্রাকারে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে ফসলে রোগবালাই বেশি হয়। সে কারণে কীটনাশক বেশি ব্যবহার করতে হয়। এই কীটনাশক বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক জগতে মিশে গিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাই সবদিক বিবেচনা করে জৈব সার উৎপাদন এবং এর ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার এবং জনগণ সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এখন প্রতিদিন আমাদের শহরগুলোতে ১৭ হাজার টন আবর্জনা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ২০২৫ সাল নাগাদ তৈরি হবে ৪৭ হাজার টন আবর্জনা। সাড়ে ৪ হাজার টন ময়লা সামাল দিতে ডিসিসির বেহাল অবস্থা। ডাম্পিংয়ের জন্য নতুন জমি না নিলে ২ বছর পর ময়লা ফেলার জায়গা থাকবে না। ওয়েস্ট কনসার্নের নির্বাহী পরিচালক মাকসুদ সিন্‌হা ২০০০কে বলেছেন, 'ডিসিসি ময়লা অপসারণের জন্য প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকা খরচ করছে, কিন্তু তারা যদি আবর্জনাগুলোকে জৈব সারে পরিণত করতে পারে তবে ৩০ কোটি টাকা খরচ তো হবেই না বরং প্রতি বছর ৩৬ কোটি টাকা বেশি আয় করতে পারবে। আমাদের প্রিয় নগরটিকে আবর্জনায় বিষিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সবার সচেতন হওয়া দরকার। যার যার অবস্থান থেকে নিজের আশপাশের পরিবেশ পরিকল্পিতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। সরকার এবং সিটি কর্পোরেশনের উচিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। প্রয়োজনে আবর্জনা অপসারণ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া উচিত।

ছবি : **তুহিন হোসেন ও আনোয়ার মজুমদার**